নিশুত রাতের ভূত

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভূতের ডেরায় ভুতো ১১
নিশুতরাতের ভূত ৬৭

ভূতের ডেরায় ভুতো

মারমুখী মায়ের তাড়া খেয়ে ভুতো ছুটতে-ছুটতে থামল এক্কেবারে ভূ তের ডোবার ধারে এসে। তখন খাঁখাঁ দুপুর। খনখনে রোদ্দুর ছড়ানো চতর্দিকে। বাতাসে আগুনের হলকা। পথঘাট বুনোঝোপ গাছপালা সূর্যিমামার আগুনে পুড়ে মুচমুচে। ডোবার ধারের বাঁশবনের নীচে একচিলতে ছায়ার সান্ত্বনায় এসে ছোটায় ব্রেক কষল ভুতো। অনুমান করল, না, মায়ের পক্ষে আর এদ্দূর ছোটা সম্ভব নয়। এতক্ষণে পায়ের শিরায় টান ধরার কথা। বাড়িও ফিরে গেছেন নির্ঘাত। ভেবে ঘাসবিছনায় আরাম করে বসল ভুতো। তারপর লালুর মতো হ্যাহ্যা করে হাঁপাতে থাকল।

ভুতো ভালো ছেলে নয় মোটেও। বাজে ছেলে। বখাটে, মন্দ ছেলে ও। অকালকুষ্মণ্ড অপদার্থ ছেলে। কী বাড়ির লোকজন-কী পাড়াবাসী তাই বলে ওকে সবাই। বলারই কথা। যেমন হাতে-পায়ে দুষ্টু ভুতো, তেমনি পড়াশোনায় লবডঙ্ক, অশ্বডিম্বটি। প্রতিবারের পরীক্ষায় গণ্ডা-গণ্ডা রসগোল্লা পেয়ে এক্কলাসে ধ্যাড়ায় ও। প্রতিবার স্কুলের হেডমাস্টারের গার্জেন কল। টিসির হুমকি। তবে সেই ছেলেকে গুডবয় বলবে কে?

উপরি চুরিটুরিতেও অল্পস্বল্প হাত পাকিয়েছে ইদানীং ভুতো। সময়-সুযোগ পেলেই মায়ের পানবাটা থেকে, বাবার ফতুয়ার পকেট থেকে দেদার পয়সা ঝাড়ছে ও। স্কুলের বন্ধুদের পেন্সিল-ইরেজার চোখের নিমেষে হাতসাফাই করছে। উপরি আজ সে ব্রজমামার টেবিলক্লথের তলা থেকে দশটাকা হাতিয়েছে। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে অমনি ব্রজমামার মায়ের কাছে নালিশ। মাও রণচণ্ডীমূর্তিটি ধারণ করে তাঁতগর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে ওর পিছু নিলেন। ভাগ্যিস মায়ের বাতের ব্যথা দু-পায়ে। টুকটুক করে হাঁটলেও ছুটতে পারেন না তত। তাই রক্ষে।

সে যাক গে। আপাতত ভয়মুক্ত ভুতো। খাঁখাঁ রোদে ছায়াপ্রদানকারী বাবলাগাছটির দিকে তাকিয়ে আপনমনে ভাবে ও, আজ তোর কোলেই আশ্রয় নিলাম হে কণ্টকবৃক্ষ। খাওয়া না-জুটুক, তোর হিমশীতল হাওয়ায় হাঁফধরা প্রাণটি জুড়োই অন্তত।

ভুতো এখনও ছোটো। সবে ক্লাস ফোর ও। যদিও ঠিকঠাক পাস করলে এদ্দিনে সিক্স-সেভেন হওয়ারই কথা ছিল। বয়েসে এগারো-বারো বটে তাই ভুতো এখন। টিংটিঙে লম্বা খ্যাংরাকাঠি চেহারা ওর। গায়ে মাংস বলতে নেই। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে হাড় ক-খানা দিব্যি গোনা যায়। তবে মুখটি ভারী মিষ্টি ওর। শ্যামলা মুখখানিতে মুক্তোদানা দাঁতগুলি ঝিলকিয়ে হাসে যখন ভুতো, সাক্ষাৎ ননীচোরা গোপাল ও। অবিকল ছোট্টবেলাকার কেষ্টঠাকুরটি।

রাদ্দিন দুষ্টুমি করে বেড়ালেও গায়ে জোরটোর নেই তেমন ভুতোর। পারলে বাতাসে উল্টে পড়ে। যদিও মনের জোরটি বেশ। সব কাজে বিপুল সাহস দেখাবে। এর-ওর আমবনে-লিচুবনে ঢুকে হনুমানের মতো হড়হড় করে গাছ বাইবে। তারপর চোখের নিমেষে আম-জাম-লিচু হাপিস।

উপরি ভূতের ভয় নেই ভুতোর কোনোকালে। ভূতপ্রেতের নাম শুনে বড়োদের মতো ফিচেল হাসে ও। মাথা ঝাঁকায়। তারপর ফড়ফড়িয়ে বলে, ধুস্! ভূত বলে কিছু নেই। সে বইয়ের পাতায় আছে। থাকলে দেখতাম বটে একদিন-না-একদিন।

কিন্তু আমি তো দেখেছি। ঠাকুমাও। তারপরও অবিশ্বাস? বেশি পাকা!

কুট্টুসের এমন কথায় ফিচেল হাসে ভুতো। তর্ক জোড়ে। ভুরু কুঁচকে বলে, কোথায় দেখেছিস বল শুনি? তোর ঠাকুরমাই বা কোথায় দেখল? ঢপবাজির আর জায়গা পাস না?

এই চোপ! অমনি দাবড়ায় কুট্টুস। ঢপ কেন দেব? নিজের চোখেই দেখেছি যে! আমার ঠাকুরমাও দেখেছেন। নিজের চোখেই। সেদিনও বলছিলেন।

কুট্টুসের কথায় হাঁ-হয়ে তাকায় ভুতো। সত্যি বলছিস? নিজের চোখে দেখেছিস? একদম এই চোখদুটি দিয়ে?

চোপ! ধমকে ওঠে কুট্টুস। এই চোখদুটি নয় কি তোর চোখ ধার নিয়েছি রে?

আচমকা ধমকে একটু দমে যায় বটে ভুতো। নরম চাহনি মেলে তাকায় কুট্টুসের দিকে। শান্তস্বরে বলে, বেশ, কোথায় দেখেছিস বল তবে? কেমন দেখতে ছিল ভূতটা? ওর কি হাত-পা ছিল? আমাদের মতোই? নাকি অন্যরকম? কেমন সুরে কথা বলল? কী বলল?

এই আর-এক উকিলবাবু এলেন। বলে কুট্টুস বিরক্ত হয়ে তাকায়। ভূত কথা বলবে কেন? ওসব আমি শুনিটুনিনি। তবে দেখেছি।

কোথায়?

আমাদের পুকুরপাড়ে। বাঁশবনে।

কখন?

রাতেরবেলা, আবার কখন?

কী করে দেখলি, শুনি? রাতে তুই ওখানে কী করছিলি?

বাথরুম করতে গিয়েছিলাম।

তারপর?

দেখলাম সাদাকাপড় পরা একটা ভূত।

কী করছিল?

দেখলাম ঝিরিঝিরি বাতাসের তালে দুলছিল যেন।

তারপর?

তারপর সোঁত করে বাঁশবনে ঢুকে গেল।

তারপর?

তারপর আর কী? মা গো, ভূত- বলে আমি দিলাম লেজতুলে দৌড়।

কিন্তু ওটা ভূত ছিল, তার কী প্রমাণ? ভূত নাকি মানুষ দেখলে ঘাড় মটকায়। বাচ্চাদের দেখলে আরও। তবে সেটি তোর ঘাড় না-মটকে বাঁশবনে ঢুকে যাবে কেন?

কুটুস ঠোঁট উল্টে তাকায়। সে আমি কী জানি? তবে ওটি ভূত ছিল।

তোর মুণ্ডু ছিল।

কী, আমার কথায় অবিশ্বাস? যাঃ, তোর সঙ্গে আড়ি।

সেই আড়ি আজও চলছে কুটুসের সঙ্গে ভুতোর। তারপর তিনদিন আলাদা-আলাদা ইস্কুলে গেল দুজনে। আলাদা বেঞ্চে বসল। ভুতো ওর দিকে ট্যারা চোখে তাকায় আর ফোড়ন কাটে- হুঁঃ! যত্ত ভাট বকার মাস্টার। ভূত না কচুপোড়া।

বাবলাগাছের নীচ থেকে বাঁশবনে এসে বসেছে ভুতো।

তুলনায় ছায়া বেশি এখানে। পিনপিনে হাওয়াও। কিন্তু রোদের বড়ো তেজ। তাই গরম বাতাস এসে মুখে লাগে ওর। ও চোখ পিটপিট করে তাকায়। কখনও চোখ বুজে আপনমনে কী যেন ভাবে।

দুপুর হয়েছে ততক্ষণে। খিদে পেয়েছে ভুতোর। এসময় বড্ড কষ্ট হয় ওর। পেটে ছুঁচো ডন মারে কিনা। ইচ্ছে করে হাতের কাছে যা পায় গপগপিয়ে তাই খায়। দুপুরে

খুব কিছু রান্নাবান্না হয় না যদিও ওদের বাড়ি। ওরা গরিবসরিব কিনা। তাতে কী। শাক লতাপাতা আলুমাখা দিয়েই আয়েশ করে একথালা মেরে দেয় ভুতো।

কিন্তু আজ কী হবে?

খাওয়ার কথা ভেবেই পটাং করে উঠে দাঁড়াল ভুতো। বাবলাবন বাঁশবনের এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে তাকাল। অদূরের তাল-খেজুরগাছগুলির দিকে জুলজুলু চোখে তাকাল। কিন্তু লাভ কী তাতে! এখানে কোথাও যে ফলটল মিলবে না। এ তো আমবাগান লিচুবাগান নয়। তবে উপায়!

বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল একবার ভুতো।

গুটিগুটি পায়ে গিয়ে রান্নাঘরের পাশে দাঁড়ালে ঠিকই দুটি খেতে দেবেন মা। রাগভুলে শান্তস্বরে বলবেন, আয়, খেয়ে যা। অনেকক্ষণ কিচ্ছু খাসনি। কিন্তু খবর্দার! আর কক্ষনো কারো পয়সায় হাত দিবি না বলে দিলাম।

শুনে অমনি ছেঁড়া কলাপাতার বাতাসে দোলার মতো মাথা দোলাবে ভুতো। ঝাঁপিয়ে পড়বে মায়ের বেড়ে দেওয়া ভাতের থালাটির উপর। তারপর পাঁচমিনিটে সাবাড়।

কিন্তু মায়ের রাগ যদি না-কমে? তেমনই রণচণ্ডীমূর্তি ধারণ করে সামনে দাঁড়ান যদি? হাতের কাছে যা-পান তাই ছুড়ে মারলেন যদি! কিংবা ছুটে এসে চুলের গোছাটি মুঠোয় পুরে পিঠের চালে ঘুপঘুপ কিলোন!

সাতপাঁচ ভেবে প্যাঁচার মতো মুখ করে আবারও বাঁশবনের নীচটায় হাঁটুমুড়ে বসল ভুতো। একটু ধুলোবালি ঘাঁটল। বাঁশপাতা কুড়োল। ক-টি শুকনো বাবলাকাঁটা হাতে নিয়ে ডোবার দিকে ছুড়ে মারল। অমনি নজরে এল ডোবার ধারজুড়ে ফোটা ভাঁটফুলগুলি।

একগাল হেসে ক-টি ভাঁটফুল তুলে আনল ভুতো।

আহা! ভাঁটফুলও এতো চমৎকার দেখতে হয়, আগে কখনও ভাবেনি ও। হাতের ফুলগুলির দিকে দূরবিন চাহনি মেলে তাকায় ও। নানাভাবে পরখ করে তাদের। আচমকা দুটি কানে গুঁজল ও। ক-টি ডোবার এঁদোজলে ভাসিয়ে দিল।

অমনি ডেকে উঠল পাখিটা। অবাক হয়ে তাকায় ভুতো বাঁশবনের দিকে। পাখিটাকে খোঁজে। দেখতেও পায়। ভারী মিষ্টি দেখতে। লেজঝোলা নয়।